Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-IV, April 2019, Page No. 76-83
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

উনিশ শতকে পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে হুগলী জেলা

দেবাশীষ সেনগুপ্ত
অতিথি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা

Abstract

Through this research article, I want to discuss "Westernization of medical science in nineteenth century Hooghly district." The history of medicine in British India is gradually emerging as one of the major areas of 'new social history.' Before the establishment of colonial rule in Bengal, this region generally had a healthy environment. However, 1806 year was different. At that time 'Black Plague' was occurs in Chandannagar. But except these events, the Hooghly district appears to have been remarkable free from epidemic and to have had a high reputation for the salubrity of its climate .But by the end of the first half of the nineteenth century, there was a change. I have selected three stages of the changes in Hooghly's medical system. In the first part, I want to show the indigenous medicines (Ayurvade and Unani medicine) of this region to locate their relevance and popularity among the population. In the second part, I want to show how new scientific temper posed a threat to the indigenous medical systems and how the colonial government wanted to adjudge herbal medicine with scientific ways and the third part, the debates and conflicts between the indigenous (Ayurvade and Unani medicine) and western medical systems. During this period, the western medical system managed to overshadow indigenous medical treatment or the local medical system.

Keywords: Public health, Epidemic, Ayurvade and Unani medicine, Germ theory, Malarial fever or Burdwan fever.

আধুনিক বিজ্ঞান ব্রিটিশ সরকারের হাতে শুধু অস্ত্রশস্ত্রই তুলে দেয়নি, আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশেষত চিকিৎসাশাস্ত্র বিবিধ কৃতকৌশলও দিয়েছে। বিজ্ঞানীদের নিরলস গবেষণার দ্বারা আবিস্কৃত হয়েছে বহুবিধ ঔষধপত্র। শাসক সম্প্রদায়কে শুধু মারণাস্ত্র দিয়েই শাসিতকে শায়েস্তা করতে হয় না, তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল পশ্চিমী চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগ। উনিশ শতকের বাংলায় ব্রিটিশ সরকার পশ্চিমী চিকিৎসা পদ্ধতিকে কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে কাজে লাগিয়েছিল এবং হুগলি জেলা ও যে সে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলনা তা আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে হুগলি জেলায় উন্নত জনস্বাস্থ্য চেতনার সুস্পষ্ট চিত্র লক্ষ্যনীয় ছিল। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ১৮০৬ খ্রীষ্টব্দ, কারণ ঐ বছর বর্ষার পর হুগলির চন্দননগরের "Black Plague" এর অনুরূপ একপ্রকার মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই ঘটনাটি বাদে ব্রিটিশদের এদেশে আগমনের পূর্বে হুগলি জেলাবাসীদের কখনো বড়সড় মহামারীর কবলে পড়তে হয়নি। জজ টয়েনরী তাঁর গ্রন্থে (A Sketch of the Administration of the Hooghly District from 1795-1845) ১৮০৬ এর মহামারী প্রসঙ্গে জানিয়েছেন

যে, "except these …the Hooghly District appears to have been remarkable free from epidemic and to have had a high reputation for the salubrity of its climate"[১] একইভাবে হুগলি জেলার আবহাওয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন হিকি সাহেব (১৭৭৮ সালে তিনি চুঁচুড়ায় আসেন)। তিনি তাঁর স্মৃতি কথায় হুগলি জেলার আবহাওয়া ও পরিবেশকে কলকাতার থেকেও স্বাস্থ্যকর বলে উল্লেখ করেছেন।[২] এছাড়া উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এই জেলার ব্যান্ডেল, কালনা, কাটোয়া, বর্ধমান প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর অঞ্চল হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। এগুলি Resort হিসেবে। ব্যবহৃত হত।[৩] কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে হুগলি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার চিত্র পাল্টে যায় এবং আর জন্য ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব নেহাতৎ কম ছিল না। দেশীয় শিক্ষার মত প্রাচ্যের চিরাচরিত চিকিৎসা ব্যবস্থাও পশ্চিমী সভ্যতার চাপে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। তার কারণ এই নয় যে, আয়ুবেদ, ইউনানী বা কবিরাজী চিকিৎসার কার্যকারীতা শেষ হয়ে গিয়েছিল বা তা ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল। মূল কারনটি এই যে, ব্রিটিশরাজ এর পক্ষে তা আর লাভজনক ছিল না। তাই আয়ুর্বেদ ও ইউনানীর মত দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্রমশ পশ্চাদপসারণ ও অপমৃত্যু ঘটে।[৪] হুগলি জেলায় পশ্চিমী চিকিৎসা পদ্ধতি কীভাবে দেশীয় বা লোকায়ত চিকিৎসা পদ্ধতির স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছিল তা তিনটি পর্যায়ের মাধ্যমে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্বে পশ্চিমী ও চিরাচরিত দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে পারস্পরিক সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায় এবং তা বজায় ছিল ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই পর্বে ব্রিটিশ সরকার মূলত দেশীয় ভেষজ বিদ্যাকেই অনুসরণ করেছিলেন এবং এই চিকিৎসা পদ্ধতির পরীক্ষা ও প্রয়োগে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে নেটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে আয়ুর্বেদ এবং ইউনানী চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতা মাদ্রাসায় বিশেষ ক্লাস নেওয়া শুরু হয়। পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত আয়ুর্বেদ শিক্ষক হিসাবে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাকতা আরম্ভ করেছিলেন।[৫] দ্বিতীয় পর্বে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় ভেষজ ঔষধগুলিকে বিজ্ঞানের আলোকে যাচাই করে তাকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে আরো গ্রহনযোগ্য করে তোলার উদ্যোগ গ্রহন করেন। এর পাশাপাশি পশ্চিমী ঔষধপত্রেরও চলন শুরু হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সময়ে ব্রিটেনে চিকিৎসা জগতে পেশাদারি মনোভারের উদ্ভব ঘটে। তারই প্রভাবই এদেশেও সরকার ঔষধের গুনমান নির্ণয় সাপেক্ষ তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন।[৬] তাছাড়া স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে চিকিৎসকের অপ্রতুলতাও সরকারকে দেশীয় হাকিম বা কবিরাজদের ওপর নিভরশীল হতে বাধ্য করেছিল। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের এক সরকারী বিবরণীতে হুগলি জেলার দপ্তর অধীনে চিকিৎসক ও জনসংখার অনুপাত ছিল ১:১৫১১ জন।[৭]

জেলা	জনসংখ্যা	চিকিৎসক	অনুপাত
হুগলি	৩৪,৭৬১	২৩ জন নিম্নসহ শল্যচিকিৎসক ৫ দেশী চিকিৎসক ৫ ঔষধ প্রস্তুতকারক ১৫ মোট ২৫	১ প্রতি ১৫১১ জন

চিকিৎসা ধারার তৃতীয় পর্বটি শুরু হয় উনিশ শতকের শেষার্ধে। তখন পাশ্চাত্য চিকিৎসা দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকে এমনভাবে গ্রাস করেছিল যে তার আর পৃথক অস্তিত্ব ছিলনা বললেই চলে। ইউরোপে এইসময় রাসায়নিক শিল্পের অগ্রগতি ঘটেছিল এবং তার পাশাপাশি চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। একইভাবে হুগলি জেলায়ও পশ্চিমী ঔষধপত্রের ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়েছিল। অন্যদিকে দেশীয় হাকিম, কবিরাজরা তাদের পূর্বতন জায়গাটি ফিরে পাবার চেষ্টা করে। আর এই প্রচেষ্টা থেকেই পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে পরবতীকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।[৮] যেহেতু দেশীয় বা লোকায়ত চিকিৎসার ধারণা এদেশের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, তাই আয়ুর্বেদ ও ইউনানী চিকিৎসা ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে জাতীয় সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন এদেশীয় চিকিৎসকরা।

চিকিৎসা ব্যবস্থার উপরিউক্ত ধারাগুলি হুগলি জেলার প্রক্ষিতে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত দেশীয় চিকিৎসার দুটি পরিপূরক পদ্ধতি আয়ুর্বেদ ও ইউনানী এই জেলাতেও বেশ জনপ্রিয় ছিল। সাধারণত ইউনানী মেডিসিনকে বলা হয় "An admixture of Arabic medicine or Tibbi with lonian Greek medicine developed through close contacts of Arabian medical men with the physicians of lonia."[৯] আইয়োনিয়ান ও গ্রীক মেডিসিন হল প্রাচীন গ্রীক ভারতের আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মেলবন্ধন। সেক্ষেত্রে ইউনানী চিকিৎসাকে "A hybrid amalgam of the Greeko-Arabic and Ayurvedic medical practice."[১০] বলা অযৌক্তিক হবে না। একই সময়ে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাও জনপ্রিয় ছিল। চরক-সুশ্রুতের চিকিৎসা পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণরা আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। জাতিগত ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলিমদের পারস্পরিক বিভিন্নতা থাকেলও চিকিৎসার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সংঘাতের কোনো নজির পাওয়া যায় না, বরং উভয় ধারার চিকিৎসা শাস্ত্রের পারস্পরিক নিভরশীলতা দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলেছিল।

ও' ম্যালি তাঁর হুগলি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার এ এই জেলার দেশজ চিকিৎসার জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও পশ্চিমী চিকিৎসা ক্রমশ দেশজ চিকিৎসাকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল, তথাপি তাঁর মতে, The bulk of Hindus and Mohamadans have not yet lost faith in old systems of medicine, kabiraji and yunani."[১১] ঔপনিবেশিক হুগলি জেলার জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ইমামবাড়া হাসপাতাল বিশেষ অবদান রেখেছিল। ১৮৩৬ খ্রিস্টব্দের আগষ্ট মাসে হাজি মহম্মদ মহসিনের ফান্ড থেকে এটি নির্মিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রথম সিভিল সার্জেন ডাঃ টমাস ওয়াইজের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। চকবাজারের এক দ্বিতল বাড়িতে এটি প্রথম খোলা হয়েছিল। প্রথম মোগলটুলি লেনের যেখানে মাদ্রাসা বসতো, সেখানে এটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে হুগলি চুঁচুড়ার বর্তমান ইমামবাড়া হাসপাতাল স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে থাকে। টমাস ওয়াইজ ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে হাসপাতালের বাৎসরিক রিপোর্টে এই হাসপাতালের রোগীর যে পরিসংখান দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় যে, ঐ বছরে ৫০২৪ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছিল, তার মধ্যে ৩৪১৩ জন হাসপাতাল থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিল, ১৫৩৭ জনের রোগের উপশম করা হয়েছিল এবং ৩৩ জনের মৃত্যু ঘটেছিল। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৭২৩৯ জন।[১২] অমিয় কুমার ব্যানাজী তাঁর হুগলি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে ইমামবাড়া হাসপাতালে নিযুক্ত দেশজ চিকিৎসকদের যে পরিসংখান দিয়েছেন তা নিম্নলিখিত:

চিকিৎসক	সংখ্যা	মাসিক বেতন
মুসলিম হাকিম	১	৭৫
হিন্দু কবিরাজ	১	৩০
সহ কবিরাজ	১	৮
কম্পাউন্ডার	২	১২
মোহরী	১	৫

সূত্র : ১৩

দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার এই ধারাটি ক্রমশ পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। আয়ুর্বেদ বা ইউনানী চিকিৎসা যখন ক্রমশ প্রতিযোগিতায় পিছু হটছে তখন তাদের মধ্যে দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। একটা শ্রেণীর প্রতিরোধের ভাষা ছিল তীব্র। এই শ্রেণীভুক্ত এক ব্যক্তি 'বিদ্যানন্দ' নামক পত্রিকায় ১৮১৮ সালে আধুনিক চিকিৎসাকে ব্যঙ্গ করে লেখেন ১০০ জনের প্রাণ নিলে ১ জন চিকিৎসক হয়, ১০০০ জনের প্রাণ নিলে ১ জন ডাক্তার হয়।[১৪] ১৮১৮ থেকে ১৮৩০ এর মধ্যে এই প্রকার ৯টি চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রতিবাদী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সুতরাং ঔপনিবেশিক চিকিৎসার শুরুর পর্বে দেশীয় ও বিদেশী চিকিৎসার মধ্যে রীতিমত সংঘাত লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত চিকিৎসকদের কণ্ঠে প্রতিরোধের সুর যতটা না তীব্র ছিল তার চেয়ে বেশী ছিল পশ্চিমী চিকিৎসাকে রপ্ত করে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার পুনরুজ্জীবন ঘটানোর প্রচেষ্ঠা। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই হুগলি জেলার মেট্রোপলিটন শহরগুলিতে পশ্চিমী শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটায় সেখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে যারা পশ্চিমী চিকিৎসা ও বিজ্ঞানকে সহজেই গ্রহন করেছিলেন।[১৫]

সরকার চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রথম পর্বে যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহন করেছিলেন পরে ক্রমশ তা থেকে সরে এসে পশ্চিমী চিকিৎসা মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। হুগলির ইমামবাড়া হাসপালের ভূতপূর্ব ডাক্তার টমাস ওয়াইজের উত্তরসুরী ছিলেন জেমস এসডিল (James Esadile), যিনি সম্মোহন বিদ্যায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তখন যন্ত্রনা উপশমে কাযকরী পদ্ধতি সহজলভ্য ছিলনা তাই এসডিলের সম্মোহন বিদ্যার মাধ্যম রোগীকে সম্মোহিত করে অস্ত্রোপচার করার পদ্ধতি বিশেষ কার্যকারী ছিল।[১৬] অবশ্য ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ক্লোরোফর্মের আবিষ্কার সম্মোহন বিদ্যাকে অপ্রাসঙ্গিক করে দিয়েছিল। তাছাড়া সম্মোহন বিদ্যাকে পশ্চিমী যুক্তবাদীরা ঠিক বিজ্ঞান বলে মানতে পারেননি কারন তাদের প্রধান যুক্তি ছিল যে, একে যদি বিজ্ঞান বলতে হয় তবে হাকিম, কবিরাজদের মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁককেও বিজ্ঞান বলতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী আয়ুর্বেদকে আধুনিকীকরন করে পনুরুভ্যুদয়ে সচেষ্ট ছিল। হুগলি জেলার পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত ছিলেন নেটিভ মেডিকেল ইন্সটিটিউশনের- বৈদ্য অধ্যাপক, যিনি ডাক্তার গোডিভ ও তাঁর চারজন ছাত্র সহযোগে ১৮৩৬-এর ১০ই জানুয়ারী কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেন।[১৭] এটি ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রথম এদেশীয় ব্যক্তি কর্তৃক শব ব্যবচ্ছেদের ঘটনা। আর আয়ুর্বেদিকদের চোখে এটি ছিল এক প্রখ্যাত বৈদ্য পরিবারের আত্মসমর্পনের ঘটনা। আবার পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ছিল আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবনের ঘটনা। কারন আয়ুর্বেদী চিকিৎসকরা পশ্চিমী চিকিৎসার বিরুদ্ধে যে পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তাতে আয়ুর্বেদ চর্চায় শরীর জ্ঞানের আবশ্যকতা বিষয়ে তারা নিশ্চিত হন। লক্ষনীয় বিষয় হল এই যে এই ধরনের পনুরুজ্জীবনবাদী প্রকল্প, মুসলিমরা তাদের ইউনানী চিকিৎসার ক্ষেত্রের নির্মাণ করতে পারেনি, বরং ইংরেজি শিক্ষর মত পশ্চিমী চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা থেকে তারা দূরে সরেছিল। ফলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে পূর্ববতী সময়ে যে কবিরাজী ও ইউনানী চিকিৎসকদের মধ্যেকার সখ্যতা ছিল পরবতীকালে তা অপসারিত হয়ে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমান জনগণের মধ্যে ক্রমশ বৈপরীত্য থেকে বিরোধ তৈরী হতে শুরু করেছিল।[১৮]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপের চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। লুই পাস্তর মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন যে রোগের আসল কারন হল Germ বা জীবানু। রোনাল্ড রস কলিকাতায় বসে ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করেছিলেন। এইভাবে "Germ Theory"-র প্রচার করে ঔপনিবেশক সরকার স্বাস্থ্যরক্ষার নতুন পন্থা নির্মাণ করেছিলেন। অন্যদিকে প্রাচ্যের কবিরাজ, হাকিম, বৈদ্যদের উপর জনগণের আস্থা ক্রমশ কমতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমী ঘরানার চিকিৎসার প্রতি সরকারের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এছাড়াও গভীরতর কিছু কারণ ছিল, উনিশ শতকে ছিল ব্রিটিশ শাসনের সুদৃঢ়করনের যুগ। ভারতের চরম ক্রান্তিয় জলবায়ু ব্রিটিশ সেনাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকুল ছিল না। তাই তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সরকার উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। বাংলা হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশদের "Disease Laboratory"।[১৯] সেনাবাহিনীকে সাধারণ মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার চেষ্ঠা শুরু হয়। সরকার ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে দ্রুত কলেরা কমিশন গঠন করেছিল। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্যানিটারি কমিশনের এ বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন—

"Even if we look no further than the protection of the health of European soldiers, it will be evediently insufficient, if we endeavor to improve the conditions of our cantonment alone and ignore the existence of masses of the native population by which our troops are surrounded"[২০] তাছাড়া ক্রান্তীয় অঞ্চলের অসুখগুলি (বিশেষত ম্যালেরিয়া) যখন মহামারীর আকার ধারন

করেছিল তখন জন্যস্বাস্থ্য সংরক্ষণ অপেক্ষা নিজের সেনাবাহিনীকে বাঁচানোর প্রশ্নটাই সরকারের কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ডেভিড আর্নল্ড জানিয়েছেন যে, ব্রিটিশ সৈন্য মারাঠাদের বিরুদ্ধে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে যখন অগ্রসর হয়েছে তখন ৭০৪ জন সৈন্যের মৃত্যু হয়েছিল। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানীর ১০০ জন সৈন্য প্রতিদিন মৃত্যুমুখে পতিত হত।[২১] এর পিছনে ছিল কলেরার আভিশাপ। কোম্পানীর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রদত্ত রিপোর্টে দেখা যায় মাত্র ৬% সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গিয়েছিল কিন্তু তার বেশী সৈন্য মারা গিয়েছিল ম্যলেরিয়া, আমাশায়, স্মলপক্স, এবং কলেরায়।[২২] ১৮৬৭-১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় ১১০০৭ জন ইউরোপীয় সৈন্য এবং ১১২০ জন ভারতীয় সৈন্য জ্বরে মারা গিয়েছিল।

সৈন্যবাহিনীকে এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে ১৮৬৪-র Cantonment Act xxii সংশোধন করা হয়েছিল। সামরিক ছাউনি পরিচালনার জন্য একটা মোট অঙ্কের অর্থ বরাদ্ধ করা হয়েছিল। ব্যারাকগুলিতে ম্যলেরিয়া প্রতিরোধে সরকার "anti-Malaria campaign" চালিয়েছিল। শুধু ব্যারাকগুলিই নয়, তার পাশের গ্রাম, বাজার এবং সাভেন্ট কোয়ার্টাস গুলিকেও সরকারের কার্যালয় ফোর্ট গাস্তাভাস ধ্যুলিস্যাৎ করে তার উপাদান সমূহের দ্বারা ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা এক বারাক নির্মাণ করেছিল। বর্তমানে এটি চুঁচুড়ার 'কোর্ট' বিল্ডিং হিসেবে পরিচিত। ব্যারাক নির্মাণের পাশাপাশি চুঁচুড়ার গোরা সেনাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য হাসপাতাল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাও দেখা গিয়েছিল। সম্ভবত সেই উদ্দেশ্যেই ইমামবাড়া হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছিল।[২৩] তবে সেনাবাহিনীর স্বাস্থের পাশাপাশি প্রজাদের জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে শাসন একেবারেই উদাসীন ছিল তা নয়, প্রজাদের শারিরীক অসুস্থতা ও ব্যাধি যে সরকারের রাজস্বের সমানুপাতিক হ্রাস ঘটিয়েছিল তা সরকার বুঝতে পেরেছিল। বিশেষত কৃষকপ্রজা, যারা কৃষি অব্যাহত রেখে নাগরিকদের অন্নসংস্থান করতো, তাদের শারিরীক সমতার উপরই সরকারের সাফল্য নির্ভর করেছিল।[২৪] অন্তত প্রজা কল্যানের মহৎ আদর্শ না হলেও প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা থেকেই সরকার জনস্বাস্থের উন্নতির জন্য কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছিল। হুগলি জেলার জনস্বাস্থ্যকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছিল ম্যালেরিয়ার জ্বর বা তথাকথিত বর্ধমান জ্বর। ও'ম্যালি জানিয়েছেন যে উনিশ শতকের ষাট এর দশকের হুগলি জেলা এক আশ্চর্য ম্যালেরিয়া জ্বরের কবলে পড়েছিল যা বর্ধমান জ্বর নামে পরিচিত।[২৫] এটি প্রথম দেখা যায় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে যশোরের মহম্মদপুরে। সেখান থেকে নদীয়া, ২৪ পরগণা হয়ে হুগলির বান্ডেল, পান্ডূয়া, দ্বারবাসিনী প্রভৃতি স্থানে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। এই জ্বরের উৎপত্তির একাধিক কারন ছিল, তবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল এই যে, রেলপথ নির্মাণ করতে গিয়ে সরকার স্বাভাবিক জল নির্গম ব্যবস্থাকে বিপর্যস্থ করে দিয়েছিল। আর তার ফলেই ম্যালেরিয়ার উদ্ভব ও তা দ্রুত মহামারীর আকার ধারন করেছিল। সেই সময় ব্রিটিশ সরকার যে কমিশন গঠন করেছিল তার একমাত্র ভারতীয় সদস্য ছিলেন রাজা দিগম্বর মিত্র। তিনি মনে করেছিলেন যে, রেললাইন বসানোর জন্য সরকার নদীর গতিপথে যত্রতত্র বাঁধ বির্মাণ করেছিল। এর ফলে নদী তার চলার সাবলীল গতিপথ হারিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ জলাশয়ের সৃষ্টি করেছিল। আর সেই বদ্ধ জলাশয়ের সহজেই ম্যালেরিয়া জীবাণু বহনকারী মশার প্রাদুর্ভাব ঘটে।[২৬] এইভাবে দিগম্বর মিত্র ম্যালেরিয়ার কারণ হিসেব রেলপথ তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর মতে, পান্ডূয়া থেকে কালনা পর্যন্ত দুটি সড়ক নির্মিত হওয়ায় নদীপ্রবাহ বিপর্যস্থ হয় এবং তার পরেই সেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়।[২৭] দিগম্বর মিত্রের ন্যায় প্রশাসনিক কর্তারাও এবিষেয়ে সচেতন ছিলেন যে, রেলপথ ও সড়ক নির্মাণের ফলে বিপর্যস্ত নির্গম ব্যবস্থাই এই মহামারীর জন্য দায়ী ছিল। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মে হুগলি জেলার স্যানিটারি কমিশনার একটি রিপোর্টে লিখেছিলেন- "I now come to what I belief to be the most important of all the causes of so called malarious fever, viz, insufficient drainage, the partial or complete obliteration of rivers…"[২৮]

রেলওয়ে বাঁধ তত্ত্ব বা নিকাশী তত্ত্বটি খুব সহেজই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল কারণ ঔপনিবেশিক সরকারকে এর মাধ্যমে দোষারোপ করা গিয়েছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ মহামারীর দায় নিতে চায়নি। হুগলির স্যানিটারি কমিশনার ক্রাফোর্ড ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের রেলওয়ে বাঁধ তত্ত্বের দুটি সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেন। তাঁর মতে, যশোর-

মেদিনীপুরের রাস্তা নির্মাণের সাথে সেখানে ম্যালেরিয়া প্রসারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। তাঁর দ্বিতীয় যুক্তি ছিল বর্ধমান জ্বর পূর্ব থেকে (যশোর) পশ্চিমবঙ্গে (বর্ধমানে) এসেছিল। কিন্তু রেলপথের প্রসার পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ঘটে। সুতরাং তাঁর মতে, রেলপথ নির্মাণের সাথে ম্যালেরিয়ার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না।[২৯] অপরদিকে হুগলির R.F Thomson, মন্তব্য করেছিলেন মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পেয়েছিল কবিরাজ, হাকিম প্রভৃতি দেশীয় চিকিৎসকদের ভুল চিকিৎসার ফলে। তিনি আরও বলেছেন- It was endemic and not epidemic, the village which have suffered most are situated inland and far from the line of rail."[৩০]

বর্ধমান জ্বরের কারণ যাই হোক না কেন হুগলি জেলার অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে এর প্রভাব যে মারাত্বক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্ধমান জ্বর ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে মহামারীর আকার ধারণ করেছিল এবং এর ফলে হুগলি জেলার জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল। জ্বরের ভয়াবহতা সম্পর্কে সরকারও সচেতনতা ছিলেন, তা না হলে সরকার জেলার বিভিন্ন স্থানে ১২টি Fever Dispensary খুলতো না। ত্রিবেণী, পান্ডুয়া, গুপ্তিপাড়া, হুগলি, দ্বারাসিনী, শ্রীরামপুর, সুলতানগাছি, বৈদ্যবাটি, চন্দননগর, বালি, সিঙ্গুর প্রভৃতি শহরে মহামারী রোধের জন্য আপাতৎকালীন ডিসপেনসারি খোলা হয়েছিল।[৩১] ও'মালি জানিয়েছিলেন যে, ১৮৭১-৮১ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত এই দশ বছরে হুগলি জেলার জনসংখ্যা প্রায় ১৩% হ্রাস পেয়েছিল। আর এর প্রধান কারণ হিসেবে তিনি বর্ধমান জ্বরকেই দায়ী করেছেন।[৩২] সাধারণ জনজীবনে বর্ধমান জ্বরের প্রভাব ছিল নেতিবাচক। মৃত্যুহার বৃদ্ধির ফলে জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামগুলি জনশূণ্য হয়ে পড়েছিল। পান্ডূয়া, ধনিয়াখালি, বাঁশবেড়িয়ার মতো গ্রামের $^{১}/_{৪}$ ভাগ জমি অনাবাদী থেকে গিয়েছিল।[৩৩] হুগলি মেডিকেল গেজেটিয়ারে সাধারণ মানুষের অভিবাসনের বিষয়টি উল্লেখিত না থাকলেও, এই সময় অবস্থাপন্ন পরিবারগুলি যে শহরে নিরাপদ আশ্রয় চলে যাচ্ছিল তা সমসাময়িক সাহিত্য, বিশেষ করে শরৎসাহিত্যে সহজলভ্য। ডঃ অরবিন্দ সামন্তও তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছিন যে, "The better and Weal-their classed had in many cases, removed to large towns either permanently or temporarily after subletting their land."[৩৪] এই সংকটের সময় জেলার মানুষের মধ্যে দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ধনী সচ্ছল, অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী পশ্চিমী চিকিৎসার সুযোগ গ্রহনের জন্য শহরে চলে গিয়েছিল, অনদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বরকে নিয়ে তেমন কোন উদ্বেগ বা উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়নি। তারা চিরাচরিত দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতিকেই আঁকড়ে ধরে থেকেছিল। আর সেই সঙ্গে মহামারী থেকে নিস্তার পাবার জন্য তারা লৌকিক দেবদেবীর আশ্রয় নিয়েছিল। যেমন কলেরার জন্য হিন্দুরা তুষ্ট করতো ওলাইচন্ডিকে, আর মসুলমানেরা তুষ্ট করতো ওলাই বিবিকে।[৩৫] বসন্তরোগ থেকে মুক্তির জন্য তারা শীতলার আরাধনা করতো। ম্যালেরিয়ার জন্য নির্দিষ্ট দেবদেবী না থাকলেও হুগলি জেলায় যে জ্বরাসুরের পুজা প্রচলিত ছিল তা মূলত ম্যালেরিয়াকে কেন্দ্র করেই হত। এইভাবে নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষেরা লৌকিক দেবদেবীর উপর তাদের আস্থা বজায় রেখেছিল।

বর্ধমান জ্বরের প্রকোপ গ্রামের পর গ্রাম উজার হয়ে গিয়েছিল, যারা বেঁচেছিল তাদের জীবনী শক্তিটিও শুষে নিয়ে শক্তিহীন করে এই অভিশাপ বর্ধমান জ্বর এবং বাঙালিকে পরিণত করেছিল 'ধংসোন্মুখ জাতিতে'। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণি এই বর্ধমান জ্বর বা ম্যালেরিয়া সহ সকল প্রকার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রেই নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করার জন্য এই প্রচার করেছিলেন যে বাঙালিরা রুগ্ন জাতি। ফলে তাদের রোগ ব্যাধি, মহামারী সবই একান্তভাবে নিজস্ব জাতিগত বিষয়।[৩৬] স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এই জাতি তত্ত্ব বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি মেনে নিতে পারেনি। এই তত্ত্ব যে যথার্থ নয়, তা প্রমাণ করার জন্য তারা পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থাকে গ্রহন করতে, এমনকি পশ্চিমী চিকিৎসাবিদ্যারত নিরিখে দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার (আয়ুর্বেদ) আধুনিকীকরনে যত্নবান হয়েছিল। তাছাড়া ঔপনিবেশিক জনস্বাস্থ্য নীতি ছিল কেবলমাত্র শহর কেন্দ্রিক, অর্থাৎ তা মলূত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং সেনাদের স্বার্থেই প্রবর্তিত হয়েছিল। প্রান্তিক এলাকায় আপামর জনসাধারণ সেই প্রকল্পের বাইরে থেকে গিয়েছিল। কারণ ঔপনিবেশিক সরকার এই প্রান্তিক এলাকায় পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্য নীতিকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ

করেনি। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল সাধারণ জনসমাজে শিক্ষার প্রসার না ঘটার বিষয়ও। ফলে প্রান্তিক এলাকার মতো শহরাঞ্চলেও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত মানুষ পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে অসচেতন থেকে গিয়েছিল। সুতরাং পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল এবং সভ্য সমাজের মানুষের প্রয়োজনীয় বিষয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আমার আলোচ্য হুগলি জেলাতে তো বটেই সমগ্র বাংলার ক্ষেত্রেও জনসংখার সঙ্গে পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থার চাহিদা ও যোগানের বিস্তর ফারাক থেকে গিয়েছিল। ফলে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা সার্বিকভাবে কার্যকর হতে পারেনি।

তথ্যসূত্র:

১) Toynbee, George: A Sketch of the Administration of the Hooghly District from 1795-1845 (edited- Gonesh Nandy) Bengal, 1st Edition, October, 1888, p. 209

২) ঘোষ, বিনয়: কলিকাতা শহরের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড), বাক সাহিত্য, পঞ্চম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৪, পৃ. ২১৮

৩) স্বাস্থ্য, দ্বিতীয় খন্ড, সপ্তম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩০৫, পৃ. ১৬৪

৪) Bala, Poonam: Imperialism and Medicine in Bengal (Ph.D Thesis) Sage Publication, New Delhi, 1991, p. 41- 42

৫) পালিত, চিত্তব্রত: বিজ্ঞানের আলোকে ঔপনিবেশিক বাংলা, দেজ, জানুয়ারী, ২০০৫, পৃ. ৮৬

৬) Bala, Poonam, op.cit. p. 41

৭) পালিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

৮) Bala, Poonam, op.cit. p. 76

৯) Mukherjee, Sujata, "Unani Medicine and Syhcretic Medical Culture in Pre-colonial and Colonial India." Journal of History, the University of Burdwan, Vol. viii, 2006 (Edited by Dr. Malabika Roy), p. 89

১০) Ibid., p. 91

১১) Malley, L.S.S.O.: Bengal District Gazerreers, Hooghly Logos Press, New Delhi, reprinted 1985, p. 134

১২) Toynbee , op.cit., p. 204

১৩) Banerjii, Amiya Kumar: West Bengal District Gazetteers, Hooghly, Secretariat Press, Calcutta, 1972, p. 574

১৪) ভট্টাচার্য, জয়ন্ত: আয়ুর্বেদ, অ্যানাটমি ও উপনিবেশকালের চিকিৎসা জ্ঞানতাত্ত্বিক সংগ্রামের দিকচিহ্ন, প্রবন্ধটি অবভাস-এ রয়েছে, সম্পাদনা- ভট্টাচার্য, জয়ন্ত, মার্চ ২০০৯, পৃ. ৮৮

১৫) বসু, প্রদীপ (সম্পাদিত): সাময়িকী, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ২০

১৬) আঢ্য, কুমার অক্ষয়: হুগলি চুঁচুড়ার নানা কথা (দ্বিতীয় খণ্ড), হুগলি সংবাদ, হুগলি, ২০১০, পৃ. ১২১

১৭) তদেব, পৃ. ১২৩

১৮) Toynbee, George, op.cit., p. 204

১৯) সামন্ত, অরবিন্দ: রোগ রোগী রাষ্ট্র (ঊনবিংশ শতকের বাংলা), প্রগেসিভ, কলকাতা, জুন ২০০৪, পৃ. ৩০

২০) Sinha, Sandeep, 'Public Health in Bengal, the Early Colonial Bengal Period in journal of History (Edited by Papia Chakraborty), Jadavpur University, Vol. XI, 1990-91, P. 69

২১) Ibid.

২২) চক্রবর্তী, দীনেশ: ঔপনিবেশিক ভারতের মহামারী ও জনসংস্কৃতি, অনুষ্টুরপ, XXIII,1, 1988, পৃ. ১৭৫
২৩) আঢ্য, কুমার অক্ষয়: হুগলি চুঁচুড়ার নানা কথা (দ্বিতীয় খণ্ড), হুগলি সংবাদ, হুগলি. ২০১০, পৃ. ১৯
২৪) সামন্ত, অরবিন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
২৫) Malley, L.S.S.O., op.cit., p.127
২৬) Crawford, D.G., Hugli Medical Gazetteers, West Bengal District Gazetteers, Calcutta 1903, p. 147-148
২৭) Samanta, Arabinda: Malarial Fever in Colonial Bengal, 1820-1839, Firma K. L. M., Calcutta, 1st Published 2002, p. 37
২৮) Hunter, W.W.: A Statistical Account of Bengal, West Bengal District Gazetteers, Calcutta, 1st reprint, October, 1997, p. 197
২৯) Carwford, D. G., op.cit., p. 133-170
৩০) Ibid., p. 118
৩১) Ibis., p. 147-148
৩২) Malley, L.S.S.O' , op.cit, p. 127
৩৩) Carwford, D.G., op.cit., p.12
৩৪) Samanta, Arabinda, op.cit., p.186
৩৫) Ibid., p. 154
৩৬) ভট্টাচার্য, জয়ন্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫-১৩৬